আইএমএফ কাহনের এক অধ্যায়

আসজাদুল কিবরিয়া

নানা টালবাহানার পর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) অবশেষে দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি সহায়তা (পিআরএজিএফ) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে চতুর্থ কিস্তির ঋণ সাহায্য ছাড় করেছে। এই চতুর্থ কিস্তির অর্থ পেতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ছয়মাস। আইএমএফ-এর দিক থেকে অবশ্য কোনো গলদ ছিল না। কারণ, চুক্তির ধারা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে না পারলে সাহায্য যে মিলবে না তাতো বাংলাদেশ সরকারকে আগেই অবগত করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী গত ডিসেম্বর মাসেই রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক বিক্রির বিষয়ে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ছিল। সরকার তা না পারায় আইএমএফ কিস্তির অর্থ ছাড় বন্ধ রাখে ও সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে থাকে। শেষমেশ গত মে মাসে রূপালী ব্যাংক বিক্রির বিষয়ে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। এর পর আইএমএফ জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই কিস্তির অর্থ ছাড় করানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। ফলে, চলতি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ৯.৮৫ কোটি ডলারের কিস্তির অর্থ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে যুক্ত হয়েছে। পিআরএজিএফ চুক্তির আওতায় প্রাথমিকভাবে ৬ মাস অন্তর অন্তর মোট সাতটি সমান কিস্তিতে বাংলাদেশকে ৪৯ কোটি ডলার দেয়ার কথা। তবে গত বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আইএমএম বাণিজ্য সহায়তা হিসেবে আরো ৭.৮ কোটি ডলার অনুমোদন করে এবং এটি পিআরজিএফ তহবিলে যুক্ত করে দেয়। এছাড়া আইএমএফ বাজার দরের ভিত্তিতে মোট তহবিলের কিছু পুনর্বিন্যাস করায় মোট ঋণ সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮.৫ কোটি ডলার। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কিস্তিতে বাংলাদেশ পিআরজিএফ-এর নিয়মিত তহবিলের সঙ্গে বাণিজ্য সহায়তার কিস্তিটিও পাবে।

বাংলাদেশই তো চেয়েছে

আইএমএফ-এর পিআরএজিএফ তহবিলের সহায়তা পাওয়ার গোটা প্রক্রিয়াটি এমনভাবে সাজানো, যাতে সমস্ত দায়-দায়িত্ব সুকৌশলে সাহায্য গ্রহণকারী দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইএমএফ-এর পরামর্শ অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আইনগত দিক থেকে আইএমএফ-কে সরাসরি অভিযুক্ত করার কোনো উপায় নেই বললেই চলে। বরং শর্ত পালনে ব্যর্থতার দায়ও পুরোপুরি গ্রহণকারী দেশের। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। প্রতিবার কিস্তির অর্থ ছাড় করানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে একটি 'ইচ্ছেপত্র' দিতে হয়, যেখানে আগামী দিনগুলোয় কি কি সংস্কার করা হবে তার একটি রূপরেখা থাকে। পত্রের ভাষাটা এমন যেখানে বারবারই সরকারকে বলতে হয়, 'আমরা এটা করবো', 'আমরা অমুক সময়ের মধ্যে এটা করব,' 'আমরা এটা করার আশা রাখি' ইত্যাদি। ফলে, কোনো কিছু নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে আইএমএফ খুব সহজেই বলে দেয়, ' দেখো, আমরা তো কিছু বলিনি। তোমরাই বলেছ অমুক তারিখের মধ্যে অমুকটা করবে। অথচ নিজেরাই নিজেদের কথা ঠিক রাখতে পারছ না। তাহলে আমরা কিভাবে সাহায্য দেই?' এভাবে যে শর্তগুলো আইএমএফ-এর চাপিয়ে দেয়া বলা হচ্ছে, সেগুলোও কাগজে-কলমে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পালন করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু শর্ত পালনে অঙ্গীকার করা আর তা বাস্তবে পালন করা দুটো ভিন্ন জিনিস। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন চারদলীয় রাজনৈতিক জোট মনে করেছিল, আইএমএফ ও বাংলাদেশের জনগণ এবং তাকে ধোঁকাবাজি করে পার পাওয়া যাবে। বাস্তবতা যে কতোটা ভিন্ন তা এখন স্পষ্ট। একটি শর্ত পূরণ না হওয়ায় ছয়মাস পরে সাহায্য দিয়েছে আইএমএফ। অবশ্য এখানে সরকার তথা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণকে অতোটা সরলীকরণ করা ঠিক হবে না। কারণ আইএমএফ যে কি জিনিস তা তারা জেনেশুনেই অগ্রসর হয়েছে। এতে রাজনৈতিক দলের কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং বারোটা বেজেছে দেশ ও জনগণের। তিন বছরে ৫০ কোটি ডলারের জন্য সরকার জনসাধারণের ভোগান্তি বাড়িয়ে হলেও কি রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে বিভিন্ন শর্ত পালন করার জন্য। অথচ যে সব বাংলাদেশী বিদেশের মাটিতে ঘাম ঝরিয়ে বছরে ৩৮০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে, তাদের জন্য সরকারের কোনোরকম চিন্তা ভাবনা নেই। বরং মাঝে-মধ্যে দেশে আপনজনদের সঙ্গে দেখা করতে এলে বিমানবন্দরে জোটে তিক্ত অভ্যর্থনা আর লাঞ্ছনা। কিভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো যায় এবং প্রবাসীদের উৎসাহিত করা যায়, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সরকারের। কিংবা বিদেশী পণ্য রপ্তানি করে যারা বছরে ৭০০ কোটি ডলারে বেশি অর্থ এনে দিচ্ছে, সেই উৎপাদক-রপ্তানিকারক ও শ্রমিকদের। বিশেষত তৈরি পোশাকখাতের কথা বলা দরকার। এখাতের সিংহভাগ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি ও জীবন ধারণের ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। অথচ এদের হাড়ভাঙা খাটুনি আর শ্রমে প্রতিবছর বিদেশে আমাদের রপ্তানি আয় বাড়ছে। সরকার শুধু পুঁজিপতিদের কিছু সহায়তা দিয়েই খালাস। তাও যদি সেটা পরিপূর্ণভাবে হতো। ছোট্ট একটি চালান পাঠাতেই কয়েক হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় রপ্তানিকারকদের। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীর দৌরাত্ম্যতো রয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংস্কারে আইএমএফ-এর নির্দেশনা

করণীয়	ব্যাংক	সময়সীমা
পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ	অগ্রণী	ডিসেম্বর ২০০৫
	জনতা	জুন ২০০৬
	সোনালী	ডিসেম্বর ২০০৬
বেসরকারিকরণ বা বিক্রি	অগ্রণী	জুন ২০০৬
	জনতা	জুন ২০০৭

যথারীতি উপদেশ

বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ যতোটা না সাহায্য দেয়, তারচেয়ে বেশি দেয় উপদেশ। এই সত্যটি মুখে স্বীকার না করলেও কাজে বারবার প্রমাণ করে সংস্থাগুলো। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। গতানুগতিক কিছু উপদেশের পাশাপাশি নানারকম উপদেশ দিয়েছে আইএমএফ। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সত্যিকারভাবে কার্যকর করার পরামর্শ। আইএমএফ-এর ভাষায় : 'বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নতকরণ ও সুশাসনের জন্য দাতাদের কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা নিয়ে দুর্নীতি দমনের কৌশল উদ্ভাবন জরুরি।' আইএমএফ-এর এই বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, তারাসহ দাতারা দুর্নীতি দমন কমিশনকে মোটেও কার্যকর মনে করছে না। বরং শুরু থেকে সরকার এই কমিশনকে নিয়ে যেভাবে তামাশা করছে, তা তাদেরও নজর এড়ায়নি। সরকার মনে করেছিল, কোনোভাবে একটা কমিশন করে বলে দেই যে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে। বাস্তবে সরকারের এই ধোঁকাবাজিও বেশিদূর যেতে পারেনি।

আইএমএফ অবশ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে আইএমএফ এ বিষয়টির ওপর খুব জোর দিয়ে আসছে। যে জন্য ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদের হার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিল গত এপ্রিল মাসেই। অথচ এর আগে প্রায় দেড় বছর ধরে সুদের হার কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে দিয়ে বিভিন্নভাবে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয় ব্যাংকগুলোর ওপর। ব্যাংকগুলোও যখন মাত্র সুদের হার কমিয়ে এনে একটা স্থিতাবস্থায় আসার চেষ্টা করছিল, তখন আবার উল্টো সুরে বলা হলো সুদের হার বাড়াতে হবে। এমন কান্ড যে আইএমএফ করবে তা আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল। বাস্তবে তাই হলো, দেখা দিলো অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। তারপরও নিস্তার নেই। সামনের দিনগুলোয় আরো বড় ধরনের বিপত্তি আসতে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর। আইএমএফ-এর সঙ্গে হাত মেলানোর মাশুল একটা একটা করে দিতেই হবে।